সরকারের প্রথম ১৮০ দিন

গণভোটের ম্যান্ডেট, রাষ্ট্র সংস্কার ও নাগরিক নিরাপত্তা

একটি প্রবাসী নাগরিক ও রাজনৈতিক মূল্যায়ন

NCP Diaspora Alliance Germany

আগস্ট ২০২৬

প্রতিবেদনের অবস্থান

এই প্রতিবেদন সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তৈরির জন্য নয়; বরং জনগণের দেওয়া ম্যান্ডেটের সঙ্গে সরকারের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য পরীক্ষা করার জন্য। যেখানে সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে, তা স্বীকার করা হয়েছে। যেখানে জনগণের রায়, জুলাই-পরবর্তী সংস্কার-আকাঙ্ক্ষা বা নাগরিক অধিকারের সঙ্গে সরকারের সিদ্ধান্ত সাংঘর্ষিক হয়েছে, সেখানে সেই বিচ্যুতি স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্য হালনাগাদ: ১৮ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত

প্রতিবেদন সম্পর্কে

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম ১৮০ দিন ছিল জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংস্কারের প্রথম বড় রাজনৈতিক পরীক্ষা। এই সময়ের মূল্যায়নে আমাদের প্রধান প্রশ্ন একটাই: যে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের কাছে গিয়েছিল এবং যে সংস্কারের পক্ষে জনগণ সরাসরি গণভোটে রায় দিয়েছিল, ক্ষমতায় এসে সরকার সেই রায়ের প্রতি কতটা বিশ্বস্ত থেকেছে?

NCP Diaspora Alliance Germany মনে করে, প্রবাসীরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দর্শক নয়। দেশের গণতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি এবং নাগরিক নিরাপত্তার সঙ্গে প্রবাসীদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই এই মূল্যায়ন প্রস্তুত করা হয়েছে।

মূল্যায়নের পদ্ধতি

- গণভোট, জুলাই জাতীয় সনদ, সরকারি গেজেট ও সংসদীয় সিদ্ধান্তকে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
- সরকারের নিজস্ব ১৮০ দিনের মূল্যায়নকে সরকারি অবস্থান হিসেবে এবং TIB, Human Rights Watch, জাতিসংঘ, গুম তদন্ত কমিশন ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য উৎসকে স্বাধীন পর্যবেক্ষণ হিসেবে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।
- রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা ভবিষ্যৎ ফল সম্পর্কে যেখানে সরাসরি প্রমাণ নেই, সেখানে তা “আমাদের মূল্যায়ন” বা “রাজনৈতিকভাবে এর অর্থ” হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- তথ্যগতভাবে দুর্বল বা অতিরঞ্জিত বাক্য এড়িয়ে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রকাশ্য বিতর্ক ও তথ্য-যাচাই—উভয় ক্ষেত্রেই টিকে থাকতে পারে।

১. নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেয়েছে। একই দিনে অনুষ্ঠিত গণভোটে জনগণ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পক্ষেও স্বতন্ত্র রায় দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত ফল অনুযায়ী "হ্যাঁ" ভোট ছিল ৪ কোটি ৭২ লাখ ২৫ হাজার ৯৮০ এবং "না" ভোট ২ কোটি ১৯ লাখ ৬০ হাজার ২৩১—বৈধ "হ্যাঁ" ও "না" ভোটের হিসাবে প্রায় ৬৮.৩ শতাংশ মানুষ "হ্যাঁ" বলেছে। [1]

এই গণভোটে বিএনপি নিরপেক্ষ ছিল না। নির্বাচনের আগেই দলটি প্রকাশ্যে "হ্যাঁ" ভোটের পক্ষে অবস্থান নেয়; বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানও জুলাই সনদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে "হ্যাঁ" ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। [2][3] ফলে ক্ষমতায় আসার পর গণভোট বাস্তবায়নের দায় বিএনপির জন্য শুধু সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক প্রশ্ন নয়; এটি তাদের নিজেদের ঘোষিত রাজনৈতিক অঙ্গীকারেরও পরীক্ষা।

প্রথম ১৮০ দিনে সেই পরীক্ষার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা দেখা গেছে সাংবিধানিক সংস্কারের প্রক্রিয়ায়। গণভোট-সমর্থিত বাস্তবায়ন আদেশে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন, পৃথক শপথ এবং ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করার কথা ছিল। [4] কিন্তু সরকার সেই কাঠামো কার্যকর করেনি; বরং সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথের আইনি ভিত্তিই অস্বীকার করে ১৩ জুলাই ১২ সদস্যের একটি বিশেষ সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করেছে। প্রাথমিক কমিটিতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিল না, যদিও পরে কমিটি ১৭ সদস্যে সম্প্রসারণ করে বিরোধী সদস্য যুক্ত করার সুযোগ রাখা হয়। [5]

আমাদের মূল্যায়নে এটি কোনো সামান্য প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন নয়। জনগণ একটি নির্দিষ্ট সংস্কার-প্রক্রিয়ায় "হ্যাঁ" বলেছিল; সরকার ক্ষমতায় এসে সেই প্রক্রিয়াকে অকার্যকর করে নিজের পছন্দের সংসদীয় পদ্ধতি দাঁড় করিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে এটি গণভোটের রায়ের সঙ্গে গুরুতর অসঙ্গতি এবং ভোটারদের প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে পশ্চাদপসরণ।

একই দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও দৃশ্যমান। জুলাই সনদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে নতুন ক্ষমতার ভারসাম্য, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের অধিক স্বাধীন ভোটের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ২০ আগস্টের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পুরোনো এককক্ষবিশিষ্ট সংসদ ও বর্তমান ৭০ অনুচ্ছেদের বাধ্যবাধকতার মধ্যেই হচ্ছে; সরকারদলীয় চিফ হুইপ প্রকাশ্যেই বলেছেন, দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সংসদ সদস্য পদ হারানোর ঝুঁকি থাকবে। [6][7] অর্থাৎ সংস্কারের আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ করে সরকার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ পূরণ করছে, যেখানে তাদের সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা কার্যত নির্ধারক থাকবে। আমাদের দৃষ্টিতে এটি গণভোটে অনুমোদিত সংস্কারকৃত রাষ্ট্রপতি-ব্যবস্থার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে দুর্বল করে।

মানবাধিকার ক্ষেত্রেও একই ধরনের কাঠামোগত উদ্বেগ দেখা যায়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের খসড়া আইনের নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী; TIB-এর মতে, নির্বাচন কমিটির গঠন এমন যে সরকার চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে কার্যত নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারে। [8] এমন কমিশন সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারবে কি না—এই প্রশ্ন কেবল রাজনৈতিক সন্দেহ নয়, আইনের কাঠামো থেকেই তৈরি হচ্ছে।

গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনের খসড়ায় তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের ওপর দেওয়া হয়েছে, অথচ গুম তদন্ত কমিশনের দ্বিতীয় প্রতিবেদনে পুলিশ, RAB, DB ও CTTC-কে গুমের প্রধান অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ গুমে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার বিভিন্ন ইউনিটের সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে। [9][10] একই খসড়ায় মিথ্যা ও হয়রানির উদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযোগকারীর সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের ঝুঁকি রাখা হয়েছে। [11] অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া এবং একই ব্যবস্থার মধ্যে অভিযোগকারীকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো—আমাদের মূল্যায়নে এটি ভুক্তভোগীবান্ধব ন্যায়বিচারের বিপরীত।

আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও সরকারের "দৃশ্যমান উন্নতি"র দাবি স্বাধীন পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। TIB প্রথম ১০০ দিনের পর্যবেক্ষণে মার্চ-এপ্রিলেই ৬০৫টি হত্যা, ২৯৪টি ছিনতাই, ১৯৬টি অপহরণ এবং নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে ৩,৪৯৬টি সহিংসতার ঘটনা উল্লেখ করেছে; মব-সহিংসতার ৬৯-৮০টি ঘটনায় ৩১-৪২ জনের মৃত্যুর কথাও জানিয়েছে। [12] অপরাধ সরকার ঘটায় না—কিন্তু নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। ফলে এই বাস্তবতার মুখে "পরিস্থিতি দৃশ্যমানভাবে উন্নত"—এমন আত্মতুষ্ট দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

সার্বিক অবস্থান
প্রথম ১৮০ দিনে সরকারের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সমস্যা শুধু কাজের ধীরগতি নয়; বরং কয়েকটি মৌলিক ক্ষেত্রে নির্বাচনের আগে দেওয়া সংস্কার-অঙ্গীকার এবং ক্ষমতায় এসে নেওয়া সিদ্ধান্তের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান। দ্বিতীয় ১৮০ দিনে এই ব্যবধান কমানো না গেলে জনগণের কাছে প্রশ্নটি আরও তীব্র হবে: “হ্যাঁ” ভোট কি রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য ছিল, নাকি নির্বাচনের পর ভুলে যাওয়ার জন্য?

২. গণভোটের রায়: সমর্থন চাওয়া হয়েছিল, বাস্তবায়নে কেন পশ্চাদপসরণ?

২.১ নির্বাচনের আগে বিএনপির অবস্থান

২১ জানুয়ারি ২০২৬-এ বিএনপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় যে দলটি গণভোটে “হ্যাঁ” ভোট দেবে এবং নির্বাচনী প্রচারণাতেও এই অবস্থান বজায় রাখবে। ৩১ জানুয়ারি তারেক রহমানও প্রকাশ্যে বলেন, বিএনপি জুলাই সনদকে সম্মান করে বলেই গণভোটে “হ্যাঁ” ভোট দেবে। [2][3] অতএব গণভোটের বাস্তবায়ন বিএনপির ওপর বাইরে থেকে চাপানো কোনো এজেন্ডা ছিল না; এটি ছিল তাদের নিজের ঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান।

২.২ সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জনগণ যা অনুমোদন করেছিল

প্রতিশ্রুতি/গণম্যান্ডেট	“হ্যাঁ” জয়ী হলে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন, পৃথক শপথ, প্রথম অধিবেশনের ৩০ দিনের মধ্যে পরিষদের অধিবেশন এবং ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে সাংবিধানিক সংস্কার সম্পন্ন করার কথা ছিল। [4]
১৮০ দিনে বাস্তবতা	সরকার পরিষদের পৃথক শপথ গ্রহণ করেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে দ্বিতীয় শপথের সাংবিধানিক বা আইনি ভিত্তি নেই। পরে ১৩ জুলাই একটি বিশেষ সংসদীয় সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করা হয়। [5]
আমাদের মূল্যায়ন	জনগণ একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সম্মতি দেওয়ার পর ক্ষমতাসীন দল সেই প্রক্রিয়ার বৈধতাই অস্বীকার করলে সেটি সাধারণ বিলম্ব নয়। আমাদের মূল্যায়নে এটি গণভোটে দেওয়া রায়ের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধীন করে ফেলার চেষ্টা।

সরকারের যুক্তি হলো, রাষ্ট্র বিদ্যমান সংবিধান ও আইনের মধ্য দিয়েই চলবে এবং সংস্কারও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে হতে হবে। কিন্তু এখানে মৌলিক প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয়: জনগণের কাছে যে বাস্তবায়ন আদেশের ওপর সরাসরি ভোট নেওয়া হয়েছিল, সেই আদেশের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াই যদি নির্বাচনের পরে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে নির্বাচনের আগে “হ্যাঁ” ভোট চাওয়ার রাজনৈতিক অর্থ কী ছিল?

আমাদের দৃষ্টিতে এই অবস্থান ভোটারদের সঙ্গে একটি গুরুতর রাজনৈতিক বিশ্বাসভঙ্গের ঝুঁকি তৈরি করেছে। জনগণকে এক প্রক্রিয়ার পক্ষে ভোট দিতে বলা হবে, আর ক্ষমতায় এসে অন্য প্রক্রিয়াকে “সাংবিধানিকভাবে সঠিক” বলা হবে—এটি গণতান্ত্রিক জবাবদিহির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২.৩ বিশেষ কমিটি: বিকল্প সংস্কার নাকি গণভোটের রায়কে পাশ কাটানো?

১৩ জুলাই গঠিত ১২ সদস্যের বিশেষ কমিটিতে আটজন বিএনপি সংসদ সদস্য এবং কয়েকটি ছোট দল/স্বতন্ত্র সদস্য ছিলেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্য প্রাথমিক কমিটিতে ছিল না; তবে ভবিষ্যতে বিরোধী সদস্য যুক্ত করে কমিটিকে ১৭ সদস্যে উন্নীত করার বিধান রাখা হয়। [5]

এখানে সংখ্যার প্রশ্নের চেয়েও বড় হলো ক্ষমতার নকশা। গণভোটে অনুমোদিত সংবিধান সংস্কার পরিষদ ছিল জনগণের সরাসরি রায়ের ভিত্তিতে গঠিত একটি বিশেষ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। বর্তমান কমিটি সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে গঠিত এবং ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণে। ফলে সংস্কারের গতিপথ, অগ্রাধিকার ও সময়সীমা এখন আর গণভোটে নির্ধারিত কাঠামোর হাতে নেই; তা রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।

রাজনৈতিক মূল্যায়ন
যে দল নির্বাচনের আগে “হ্যাঁ” ভোট চেয়েছিল, সেই দল ক্ষমতায় এসে “হ্যাঁ” ভোটে অনুমোদিত প্রধান বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া অনুসরণ না করলে ভবিষ্যতে এটি গণভোটের ম্যান্ডেটের প্রতি অসঙ্গতি নয় শুধু—রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের উদাহরণ হিসেবেও স্মরণীয় হতে পারে।

৩. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন: সংস্কারের আগে নির্বাচন, কার সুবিধায়?

জুলাই জাতীয় সনদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা পুনর্বিন্যাসকে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে দেখা হয়েছিল। সংসদ সদস্যদের স্বাধীন ভোটের ক্ষেত্র বাড়াতে ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কারের বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি হয়েছিল—আস্থা ভোট ও অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে দলীয় অবস্থানের বাইরে ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখার কথা বলা হয়। [13] একই সংস্কার-পরিকল্পনায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে গোপন ব্যালট ও নতুন সংসদীয় কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

কিন্তু ২০ আগস্ট ২০২৬-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হচ্ছে সংস্কার বাস্তবায়নের আগেই। সরকারদলীয় চিফ হুইপ ১১ আগস্ট বলেন, বর্তমান ৭০ অনুচ্ছেদ এই নির্বাচনে কার্যকর থাকবে এবং দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সংসদ সদস্য পদ হারানোর ঝুঁকি থাকবে। [6] অর্থাৎ কাগজে ভোট গোপন হলেও রাজনৈতিকভাবে সংসদ সদস্যের স্বাধীন সিদ্ধান্তের পরিসর দলীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকছে।

এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেবল একটি নিয়মিত সাংবিধানিক নির্বাচন হিসেবে দেখলে রাজনৈতিক বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়ে যায়। গণভোটের সংস্কার আগে কার্যকর হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতো ক্ষমতার নতুন ভারসাম্য, সংস্কারকৃত ৭০ অনুচ্ছেদ এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রেক্ষাপটে। সরকার সেই কাঠামো তৈরি না করেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন করছে।

আমাদের মূল্যায়ন
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় নির্বাচনটি রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নয়। সংস্কার আগে না করে পুরোনো কাঠামোর অধীনে নির্বাচন সম্পন্ন করলে ক্ষমতাসীন দলের বর্তমান সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্ধারক সুবিধা পায়। এতে এমন একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, যিনি পরবর্তী রাজনৈতিক পর্যায়েও ক্ষমতাসীন দলের পছন্দের সাংবিধানিক অবস্থান ধরে রাখবেন। গণভোটে অনুমোদিত ক্ষমতার ভারসাম্যের চেতনার সঙ্গে এই বাস্তবতা সাংঘর্ষিক।

৪. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন: স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, নাকি সরকারের প্রভাবাধীন নিয়োগব্যবস্থা?

মানবাধিকার কমিশনের কাজই হলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকের অভিযোগ শুনতে পারা। তাই কমিশন যদি নিয়োগ, প্রশাসন বা তদন্তের ক্ষেত্রে সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব থাকলেও কার্যকর স্বাধীনতা থাকে না।

১০ আগস্ট মন্ত্রিসভা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করে। TIB-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও কমিশনার বাছাইয়ের কমিটিতে স্পিকার, আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্ষমতাসীন দলের একজন সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব থাকবেন; অন্য সদস্যদের মধ্যেও কমপক্ষে দুজনের মনোনয়নে সরকারের কার্যকর প্রভাব থাকবে। TIB-এর মতে, এতে নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হয়। [8]

একই খসড়ায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে কমিশনকে সংশ্লিষ্ট সরকার বা বাহিনীপ্রধানের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করতে হয়; ঢাকার বাইরে অফিস স্থাপন, জনবল কাঠামো এবং সরকারি কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরকারের অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের উপাদান রাখা হয়েছে। [8]

কেন এটি গুরুতর
যে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সরকারের ভুল, পুলিশি নির্যাতন, গুম, হেফাজতে মৃত্যু বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার তদন্ত করা, সেই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব নির্বাচনে সরকার যদি কার্যত প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়, তাহলে কমিশনের স্বাধীনতা কাগজে থাকবে—বাস্তবে নয়। সরকার নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচারক নিজেই হতে পারে না; মানবাধিকার কমিশনের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য।

৫. গুম প্রতিরোধ আইন: অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানই তদন্তকারী

গুম বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় অপরাধগুলোর একটি। গুম তদন্ত কমিশন ১,৬০০-এর বেশি অভিযোগ নথিবদ্ধ করেছে; কমিশনের দ্বিতীয় প্রতিবেদনে পুলিশ, RAB, DB ও CTTC-কে প্রধান অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং অধিকাংশ গুমে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার বিভিন্ন ইউনিটের সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়। [9][10]

এই বাস্তবতার পরও ২০২৬ সালের খসড়া গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে গুমের অভিযোগ তদন্তের মূল দায়িত্ব পুলিশের ওপর দেওয়া হয়েছে। TIB স্পষ্টভাবে প্রশ্ন তুলেছে—যে বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধেই অতীতে বহু গুমের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, সেই বাহিনী নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত কীভাবে করবে? [10]

খসড়ার আরেকটি বিতর্কিত দিক হলো, কোনো অভিযোগ বিচার শেষে মিথ্যা ও হয়রানির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে অভিযোগকারীর সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। [11] ইচ্ছাকৃত মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা থাকা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু গুমের মতো অপরাধে প্রমাণের বড় অংশ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে তদন্ত যদি অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতেই থাকে, তখন কঠোর শাস্তির বিধান ভুক্তভোগী পরিবারকে অভিযোগ করা থেকেই নিরুৎসাহিত করতে পারে।

আমাদের অবস্থান
অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এটি স্বার্থের সংঘাতকে আইনি কাঠামোর ভেতরে স্থায়ী করে এবং ভবিষ্যৎ গুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বদলে দায়মুক্তির আশঙ্কা বাড়ায়। গুমের তদন্ত অবশ্যই স্বাধীন, বাহিনীনিরপেক্ষ এবং ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার অধীনে হতে হবে।

৬. পুলিশ সংস্কার: জুলাইয়ের সবচেয়ে জরুরি শিক্ষা কি আবার পিছিয়ে যাচ্ছে?

জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে থাকা পুলিশ ও নিরাপত্তা কাঠামো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কত দ্রুত দমনযন্ত্রে পরিণত করতে পারে। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের অনুসন্ধানে সাবেক

সরকার, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাঠামোর বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত দমন-পীড়ন ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি পাওয়া যায়; আন্দোলনের সময় সর্বোচ্চ প্রায় ১,৪০০ মানুষ নিহত হয়ে থাকতে পারেন। [14]

গুম তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের রাজনৈতিক ব্যবহার, বিরোধী দল দমন, নির্যাতন, গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। কমিশন এসব সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন কয়েকজন কর্মকর্তার অপরাধ নয়, একটি কাঠামোগত সংকট হিসেবে বর্ণনা করেছে। [9]

এই প্রেক্ষাপটে স্বাধীন পুলিশ কমিশন ছিল কোনো বিলাসী সংস্কার নয়—এটি ছিল জুলাইয়ের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা থেকে রাষ্ট্রকে বের করে আনার অন্যতম প্রধান নিরাপত্তা-শর্ত। কিন্তু প্রথম ১৮০ দিনেও সরকার একটি কার্যকর স্বাধীন পুলিশ কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। TIB দেখিয়েছে, Police Commission Ordinance, 2025-এর নকশাতেই "independence" অনুপস্থিত ছিল এবং অবসরপ্রাপ্ত আমলা ও সরকারি প্রভাবের মাধ্যমে কমিশনকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সরকার পরবর্তীতে কাঠামো পুনর্বিবেচনার কথা বলেছে, কিন্তু চূড়ান্ত স্বাধীন কমিশন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। [15]

রাজনৈতিক প্রশ্ন
যে পুলিশ কাঠামোর রাজনৈতিক অপব্যবহার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই কাঠামোর স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠায় ১৮০ দিন পরও অস্পষ্টতা সাধারণ প্রশাসনিক বিলম্ব হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে অনুমান না করেও বলা যায়—এই বিলম্ব ক্ষমতাসীনদের জন্য পুলিশের ওপর পুরোনো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখে। তাই বিলম্ব যত দীর্ঘ হবে, সরকারের সংস্কার-সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন ততই যৌক্তিক হবে।

৭. আইনশৃঙ্খলা: "দৃশ্যমান উন্নতি"র দাবির বিপরীতে নাগরিক বাস্তবতা

১৭ আগস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, গত ১৮০ দিনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির "দৃশ্যমান উন্নতি" হয়েছে। [16] কিন্তু সরকারের এই আত্মমূল্যায়নের সঙ্গে স্বাধীন পর্যবেক্ষণের ব্যবধান বড়। TIB-এর প্রথম ১০০ দিনের পর্যালোচনায় মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ সময়েই ৬০৫টি হত্যা, ২৯৪টি ছিনতাই, ১৯৬টি অপহরণ এবং নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে ৩,৪৯৬টি সহিংসতার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। একই সময়ে ৬৯-৮০টি মব-সহিংসতার ঘটনায় ৩১-৪২ জন নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। [12]

রাষ্ট্রের কাজ প্রতিটি অপরাধ নিজে ঠেকিয়ে দেওয়া নয়—কিন্তু অপরাধের ঝুঁকি কমানো, দ্রুত পুলিশি সাড়া, নিরপেক্ষ তদন্ত, অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় উপেক্ষা করে ব্যবস্থা এবং বিচার নিশ্চিত করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। যখন খুন, অপহরণ, মব, চাঁদাবাজি ও দখলের সংস্কৃতি জনজীবনে নিয়মিত আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে, তখন শুধু "উন্নতি হয়েছে" বলা যথেষ্ট নয়।

আমাদের মূল্যায়নে আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান দুর্বলতা হলো আত্মতুষ্টি। সরকারের উচিত সাফল্যের ভাষণ কমিয়ে জেলা ও অপরাধভিত্তিক পরিমাপযোগ্য তথ্য প্রকাশ করা—কত মামলা, কত তদন্ত সম্পন্ন, কত অভিযোগপত্র, কত গ্রেপ্তার, কত মব-সহিংসতার বিচার হয়েছে। তথ্য ছাড়া "দৃশ্যমান উন্নতি" একটি রাজনৈতিক দাবি; জবাবদিহিমূলক মূল্যায়ন নয়।

৮. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মব: স্বাধীনতার নামে অরাজকতা নয়, রাষ্ট্রীয় দমনও নয়

গণতন্ত্রে সরকারকে সমালোচনা করা, ব্যঙ্গ করা, কার্টুন আঁকা বা কঠোর রাজনৈতিক মত প্রকাশ করা অপরাধ হতে পারে না। Human Rights Watch এপ্রিল ২০২৬-এ সরকার-সমালোচনামূলক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কনটেন্টকে কেন্দ্র করে অন্তত চারজনের গ্রেপ্তারের ঘটনা নথিবদ্ধ করেছে এবং সাইবার আইন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে। [17]

TIB একই সময়ে ১৩০টি ঘটনায় ১৮৮ জন সাংবাদিকের হয়রানি, ১২টি মামলা এবং ৭টি গ্রেপ্তারের তথ্য উল্লেখ করেছে। [12] অন্যদিকে মব-সহিংসতা, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক উসকানি, ব্যক্তি আক্রমণ এবং জনতার হাতে শাস্তির প্রবণতাও

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নয়। রাষ্ট্র যদি সমালোচককে দমন করে, সেটি কর্তৃত্ববাদ; আর রাষ্ট্র যদি মবকে আইন হাতে তুলে নিতে দেয়, সেটি রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা। দুই ক্ষেত্রেই নাগরিক অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নীতিগত অবস্থান
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমা হবে সহিংসতার প্রত্যক্ষ উসকানি, বিশ্বাসযোগ্য হুমকি ও অপরাধমূলক হয়রানি—সরকারের অস্বস্তি নয়। একই সঙ্গে কোনো দল, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক শক্তিকে মব সৃষ্টি করে আইন নিজের হাতে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

৯. প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান: পুরোনো দলীয়করণ বদলে নতুন দলীয়করণ নয়

TIB প্রথম ১০০ দিনের মূল্যায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, স্থানীয় সরকার প্রশাসক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন এবং প্রশাসনিক বদলি-পদোন্নতিতে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ ও উদ্বেগ নথিবদ্ধ করেছে। [12] রাষ্ট্র সংস্কারের অর্থ পূর্ববর্তী সরকারের দলীয় প্রভাব সরিয়ে বর্তমান সরকারের দলীয় প্রভাব বসানো নয়।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে সরকারের রাজনৈতিক পছন্দের লোক বসানোর প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে সরকারকেই দুর্বল করে। কারণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ক্ষমতাসীন দলের শত্রু নয়; বরং ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সুরক্ষা-কবচ। মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশাসন—সবখানেই নিয়োগের মানদণ্ড, যোগ্যতা, স্বার্থের সংঘাত এবং সিদ্ধান্তের কারণ প্রকাশ করা উচিত।

১০. দুর্নীতি ও জবাবদিহি: ব্যক্তিবদল নয়, নিয়ম বদল

সরকার পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারের উদ্যোগ, কিছু বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহার এবং আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনার পদক্ষেপকে সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছে। TIB-ও কিছু উদ্যোগকে ইতিবাচক বলেছে। [12][18] কিন্তু দুর্নীতি প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—ক্ষমতাসীনদের জন্য নিয়ম কি একইভাবে প্রযোজ্য?

মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদধারীদের সম্পদ ও আর্থিক স্বার্থের নিয়মিত প্রকাশ, সরকারি ক্রয়ে প্রকৃত উপকারভোগী মালিকের পরিচয়, ACC-এর তদন্ত-স্বাধীনতা এবং ব্যাংকিং খাতে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সিদ্ধান্ত ছাড়া দুর্নীতিবিরোধী বক্তব্য স্থায়ী সংস্কারে রূপ নেবে না।

১১. অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়

জুলাই ২০২৬-এ মূল্যস্ফীতি ৮.৩২ শতাংশে নেমেছে—জুনে যা ছিল ৯.১৬ শতাংশ। এটি ইতিবাচক প্রবণতা। [19] কিন্তু মূল্যস্ফীতি এখনও উচ্চ এবং সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয়, খাদ্য ব্যয়, বাসাভাড়া, চিকিৎসা ও পরিবহন ব্যয়ের চাপ পুরোপুরি কমেনি। অর্থনৈতিক সাফল্যের সরকারি বিবরণে তাই শুধু সামষ্টিক সূচক নয়, বাস্তব মজুরি, কর্মসংস্থান এবং পরিবারের ক্রয়ক্ষমতাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

১২. প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা

সরকার "প্রবাসী কার্ড" চালুকে প্রথম ১৮০ দিনের একটি অর্জন হিসেবে তুলে ধরেছে। [18] এটি ইতিবাচক সূচনা, কিন্তু প্রবাসীদের বাস্তব সমস্যা কার্ডে সীমাবদ্ধ নয়। নিয়োগ-ব্যয়, চুক্তি প্রতারণা, কনস্যুলার সেবা, শ্রমিকের নিরাপত্তা, প্রবাসী বিনিয়োগ এবং দক্ষতা-স্বীকৃতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন।

- বিদেশে যাওয়ার আগে নিয়োগকর্তা, চাকরি, বেতন ও চুক্তির বাধ্যতামূলক যাচাই।
- নিয়োগ-ফির নির্ধারিত সীমা, সব অর্থপ্রদানের ডিজিটাল রেকর্ড এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে কার্যকর শাস্তি।
- দূতাবাস ও কনস্যুলেটে জরুরি শ্রমিক সহায়তা, নির্দিষ্ট সেবামান এবং অভিযোগ অনুসরণের অনলাইন ব্যবস্থা।
- প্রবাসফেরত কর্মীদের দক্ষতার স্বীকৃতি, পুনর্বাসন ও উদ্যোক্তা সহায়তা।
- প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের জন্য দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি ও একক সেবা-ব্যবস্থা।

- জাতীয় প্রবাসনীতি প্রণয়নে সংগঠিত প্রবাসী প্ল্যাটফর্মগুলোর নিয়মিত অংশগ্রহণ।

১৩. প্রথম ১৮০ দিনের খাতভিত্তিক মূল্যায়ন

নিচের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য, সরকারি বক্তব্য ও স্বাধীন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে NCP Diaspora Alliance Germany-এর নীতিগত সিদ্ধান্ত।

খাত	মূল্যায়ন	মূল কারণ
গণভোট ও সাংবিধানিক সংস্কার	গুরুতর ব্যর্থতা	"হ্যাঁ" ভোট চাওয়ার পর গণভোটে অনুমোদিত সংবিধান সংস্কার পরিষদ কার্যকর না করে বিকল্প কমিটি গঠন।
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	গণভোটের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক	সংস্কারকৃত ৭০ অনুচ্ছেদ ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ কার্যকর হওয়ার আগে পুরোনো কাঠামোয় নির্বাচন।
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	গুরুতর উদ্বেগ	নিয়োগ ও প্রশাসনিক কাঠামোয় সরকারের প্রভাব স্বাধীনতাকে দুর্বল করতে পারে।
গুম প্রতিরোধ আইন	গুরুতর উদ্বেগ	অভিযুক্ত আইনশৃঙ্খলা কাঠামোর অংশ পুলিশকেই তদন্তের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব দেওয়া।
পুলিশ সংস্কার	অপর্যাপ্ত	জুলাই-পরবর্তী সবচেয়ে জরুরি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারগুলোর একটি এখনও স্বাধীন কাঠামোয় সম্পন্ন হয়নি।
আইনশৃঙ্খলা	দুর্বল	সরকারের উন্নতির দাবির বিপরীতে হত্যা, অপহরণ, মব, চাঁদাবাজি ও সহিংসতার উদ্বেগজনক চিত্র।
মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যম	উদ্বেগজনক	সমালোচনামূলক বক্তব্যে গ্রেপ্তার ও সাংবাদিক হয়রানির নথিবদ্ধ ঘটনা।
প্রশাসন ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান	মিশ্র/উদ্বেগ	যোগ্যতার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ অব্যাহত।
দুর্নীতি প্রতিরোধ	মিশ্র	কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ আছে; কাঠামোগত জবাবদিহি এখনও অসম্পূর্ণ।
অর্থনীতি	মিশ্র	মূল্যস্ফীতি কমেছে, কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয় ও প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতার চাপ রয়ে গেছে।
প্রবাসী নীতি	ইতিবাচক সূচনা, বাস্তবায়ন বাকি	প্রবাসী কার্ডের বাইরে শ্রমবাজার ও কনস্যুলার সেবায় গভীর সংস্কার প্রয়োজন।

১৪. পরবর্তী ১৮০ দিনের জন্য ১৫ দফা দাবি ও সুপারিশ

1. গণভোটে অনুমোদিত জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে।

2. সংবিধান সংস্কার পরিষদ কার্যকর না করার রাজনৈতিক ও আইনি কারণ সংসদ ও জনগণের সামনে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

3. বিশেষ সংবিধান সংশোধন কমিটিতে প্রধান বিরোধী দলসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় পক্ষের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

4. সংবিধান সংস্কারের খসড়া জনসমক্ষে প্রকাশ করে বাধ্যতামূলক জনপরামর্শ ও বিশেষজ্ঞ শুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

5. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ সংস্কারকৃত রাষ্ট্রপতি-পদের মধ্যে রূপান্তর-ব্যবস্থা স্পষ্ট করতে হবে।

6. ৭০ অনুচ্ছেদের গণভোট-সমর্থিত সংস্কার বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করতে হবে।

7. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিয়োগ-প্রক্রিয়া থেকে সরকারের প্রাধান্য কমিয়ে বহুপক্ষীয় ও স্বাধীন বাছাইব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

8. গুমের অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের পরিবর্তে স্বাধীন, বাহিনীনিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থার হাতে দিতে হবে।

9. মিথ্যা অভিযোগের শাস্তির ধারা এমনভাবে সংশোধন করতে হবে, যাতে শুধু অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হওয়াকে কোনোভাবেই মিথ্যা অভিযোগ হিসেবে গণ্য করা না যায় এবং ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করতে ভয় না পান।

10. স্বাধীন ও কার্যকর পুলিশ কমিশনের আইন পাস ও কমিশন গঠনের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে হবে।

11. মব-সহিংসতা, চাঁদাবাজি, দখল, হত্যা ও অপহরণের মামলা ও বিচার অগ্রগতির মাসিক তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

12. সরকার-সমালোচনা, ব্যঙ্গ, কার্টুন ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্যে সাইবার ও অন্যান্য দমনমূলক আইনের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

13. সাংবিধানিক ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নিয়োগে যোগ্যতার মানদণ্ড, স্বার্থের সংঘাত ও নিয়োগের কারণ প্রকাশ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

14. মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদধারীদের সম্পদ ও আর্থিক স্বার্থের নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

15. প্রতি ৯০ দিনে সরকারকে জুলাই সনদ, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, আইনশৃঙ্খলা ও সুশাসন বিষয়ে পরিমাপযোগ্য অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

১৫. উপসংহার

এই সরকারের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো—এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু একই কারণে এর দায়ও বেশি। কারণ ১২ ফেব্রুয়ারির ভোটার শুধু একটি সরকার নির্বাচন করেননি; একই দিনে তারা রাষ্ট্র সংস্কারের দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন।

বিএনপি নিজেই জনগণকে “হ্যাঁ” ভোট দিতে বলেছিল। তাই গণভোটের রায় বাস্তবায়নে ব্যর্থতা অন্য কোনো দল বা অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে দেখানোর সুযোগ নেই। সংবিধান সংস্কার পরিষদ কার্যকর না করা, সংস্কারের আগে পুরোনো কাঠামোয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, মানবাধিকার কমিশনে সরকারি প্রভাবের ঝুঁকি, গুমের অভিযোগে পুলিশকেই তদন্তকারী করা এবং স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনে দীর্ঘসূত্রতা—এসব সিদ্ধান্ত একসঙ্গে একটি গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন তৈরি করেছে: সরকার কি জুলাইয়ের রাষ্ট্র সংস্কারকে বাস্তবে গ্রহণ করেছে, নাকি ক্ষমতায় এসে পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রের সুবিধাগুলোই ধরে রাখতে চাইছে?

এই প্রশ্নের উত্তর বক্তৃতায় নয়, সিদ্ধান্তে দিতে হবে। জনগণের “হ্যাঁ” ভোটকে সম্মান করার অর্থ শুধু জুলাই সনদের নাম উচ্চারণ করা নয়; এর অর্থ ক্ষমতার ওপর সেই সীমাবদ্ধতাগুলোও মেনে নেওয়া, যেগুলো ভবিষ্যতে বর্তমান সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রকৃত সংস্কারের পরীক্ষা সেখানেই।

NCP Diaspora Alliance Germany-এর আহ্বান

সরকারকে তার দ্বিতীয় ১৮০ দিনকে রাজনৈতিক আত্মরক্ষার সময় নয়, গণভোটের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের সময় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। জনগণের রায়ের ওপরে কোনো সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়; বরং জনগণের রায়কেই সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নৈতিক সীমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৬. তথ্যসূত্র

[1] Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) / Election Commission. EC publishes amended gazette on referendum results. 26 February 2026.
https://www.bssnews.net/news/364239

[2] BSS. BNP to vote “Yes” in upcoming referendum: Mahdi Amin. 21 January 2026.
https://www.bssnews.net/others/353334

[3] BSS. Tarique Rahman urges to vote “Yes” with “sheaf of paddy”. 31 January 2026.
https://www.bssnews.net/national-parlament-election-2026/356319

[4] BSS. Gazette of July National Charter (Constitutional Reform) Implementation Order, 2025 issued. 13 November 2025.
https://www.bssnews.net/at-a-glance/331507

[5] BSS. Special committee for constitution amendment formed. 13 July 2026.
https://www.bssnews.net/js-session/405326

[6] BSS. Article 70 to remain effective in presidential election. 11 August 2026.
https://www.bssnews.net/news-flash/413603

[7] bdnews24.com. Parliament session for presidential poll; opposition criticism over Article 70 and July Charter. August 2026.
https://bdnews24.com/bangladesh/767fa81473a5

[8] Transparency International Bangladesh. Cabinet-Approved Draft National Human Rights Commission and Enforced Disappearance Prevention and Redress Laws: TIB Expresses Deep Concern. 12 August 2026.
https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/press-release/7532

[9] BSS / Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Police, RAB, DB, CTTC main perpetrators in enforced disappearances: Report. 5 June 2025.
https://www.bssnews.net/news-flash/280458

[10] Transparency International Bangladesh. Draft Enforced Disappearance Act: concerns over police-led investigation. 29 July 2026.
https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/press-release/7522

[11] New Age. NCP wants independent body to investigate complaints; concern over Section 21. August 2026.
https://www.newagebd.net/post/politics/309788/ncp-wants-independent-body-to-investigate-complaints

[12] Transparency International Bangladesh. Government’s First 100 Days Show Promise, but Lack of Clear Roadmap on Accountability and Anti-Corruption Raises Concerns. 7 June 2026.
https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/press-release/7493

[13] BSS. BNP wants to build democratic Bangladesh through reforms — Article 70 consensus. 17 June 2025.
https://www.bssnews.net/news/283267

[14] UN Office of the High Commissioner for Human Rights. Bangladesh: UN report finds brutal, systematic repression of protests. 12 February 2025.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/02/bangladesh-un-report-finds-brutal-systematic-repression-protests-calls

[15] Transparency International Bangladesh. Police Commission Ordinance, 2025 fails to establish an independent and impartial body. 6 April 2026.
https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/story/7466

[16] BSS. Law and order improves visibly over past 180 days: Home Minister. 17 August 2026.
https://www.bssnews.net/news-flash/415417

[17] Human Rights Watch. Bangladesh: 4 Arrested for "Insulting" Government. 23 April 2026.
https://www.hrw.org/news/2026/04/23/bangladesh-4-arrested-for-insulting-government

[18] BSS / Prime Minister's Office. Public engagement, implementation of election pledges govt's major achievements in 180 days. 17 August 2026.
https://www.bssnews.net/news-flash/415503

[19] Bangladesh Bank / Bangladesh Bureau of Statistics. Current Inflation — July 2026. August 2026.
https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/inflation

প্রকাশনা নোট

এই প্রতিবেদন ১৮ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত উন্মুক্ত ও যাচাইযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। কোনো ঘটনার পরবর্তী সরকারি সংশোধন, আদালতের সিদ্ধান্ত বা নতুন প্রমাণ প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট অংশ হালনাগাদ করা উচিত। রাজনৈতিক মূল্যায়ন ও সুপারিশ *NCP Diaspora Alliance Germany*-এর নিজস্ব অবস্থান; উদ্ধৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মতামত তাদের নিজস্ব।

প্রস্তুতকারক**: NCP Diaspora Alliance Germany**